নিজের দেখা বনখণ্ড

নিয়তি, কৃষ্ণা, আয়েসা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর একসঙ্গে বলল - আমাদের গ্রামে কোনো বন নেই। পাশের গ্রামেও নেই। দিদি বললেন— এসব ঘনবসতির অঞ্চল। মন্দির, কবরস্থান, জেন এই সবের নামে কিছু বনখণ্ড এখনও আছে। না হলে সব জায়গায় বাড়ি হয়ে যেত। হয়তো নতুন করে কিছু সামাজিক বনসৃজন হতো।

অম্লান বলল দিদি, আপনাদের ওখানকার বনটাই দেখতে যাব একদিন।

— বেশ তো। দেখে আসবে। তারপর নিজেদের দেখা বন নিয়ে আলোচনা করবে। আর সেই বন সম্পর্কে লিখবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার নিজের দেখা বন সম্পর্কে নীচে লেখো :

নিজের দেখা স্থানীয় বনখণ্ড ও তার ইতিহাস

বনের নাম : গ্রাম: পোস্ট: জেলা:

কত সময় হেঁটে বনটা পেরিয়ে যাওয়া যায় :

(উত্তর থেকে দক্ষিণ) : (পূর্ব থেকে পশ্চিম):

বনে কী কী গাছ দেখেছ :

গাছের সংখ্যা কত শত বা হাজার হতে পারে :

বনে কী কী পাখি দেখেছ :

বনে কী কী পাখির বাসা দেখেছ :

বনে কী কী জলাশয় দেখেছ :

বনের ভিতরে আর কী কী দেখেছ :

ওই বনের ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের বক্তব্য

কত বছরের পুরোনো বন :

কারা দেখভাল করে :

অন্যান্য বিষয় :

ওই বন সম্পর্কে তোমার নিজের কী মনে হয়েছে

বিষয়	নিজের কী মনে হয়েছে

বন্যপ্রাণী সুরক্ষা

স্কুলের পথে চার বন্ধুর খুব তর্ক হলো। প্রণব বলল — আগে সব বনেই বাঘ ছিল। না হলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বনে থাকে বাঘ' লিখতেন? অন্যরা বলল — আগেও ছিল না। আগে থাকলে এখনও থাকত। সব বাঘ কি আর মরে যেতে পারে?

ক্লাসে এসব বলল ওরা। সব শুনে দিদিমণি বললেন — বাঘ তো অনেকরকম। ডোরা কাটা বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ। এদের কেউ না কেউ সব বনেই ছিল। ডোরাকাটা বাঘই ছিল অনেক বনে। কবি যখন লিখেছিলেন তখন এদেশে বাঘ ছিল চল্লিশ হাজারের বেশি। এখন সে সংখ্যা দু-হাজারেরও কম।

রেহানা বলল — বাঘ এত কমে গেল কী করে?

লিনা বলল— জানিস না? মানুষ বাঘ মারত। বন্দুক দিয়ে বাঘ মারতে পারলে লোকজন তাকে বীর ভাবত। নিজে বাঘ মেরেছে এমন ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখত।

সুবীর বলল— কিন্তু বাঘও এসে মানুষ খেত।

রফিক বলল — বনে খাবার পেলে বাঘ লোকালয়ে আসে না। মানুষ তো খায়ই না।

— রফিক কিন্তু ঠিকই বলেছে। খিদে না পেলে চট করে বাঘ কোনো জন্তু শিকার করে না। বেশিরভাগ সময়ই মানুষ অকারণে বাঘ মেরেছে।

--- সেজন্যই বাঘ এত কমে গেছে। তবুও যে কটা বাঘ এখনও আছে, তাদের জন্যই সুন্দরবনটা

আছে। না হলে মানুষ সব গাছ কেটে ফেলত। বাঘের জন্যই লোকে গাছ কাটতে ভয় পায়।

— তা বটে! মানুষ যত খুশি পশুপাখি মেরেছে। একটা বড়ো জন্তু ছিল চিতা। শিকারের জন্য মানুষ অনেক চিতা মেরেছে। তাতে ভারত থেকে চিতা হারিয়ে গেছে। হুইয়া পাখির পালক ছিল সুন্দর। সেই পালক ঘরে রাখবে বলে মানুষ তাদেরও মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে।

লিনা বলল —শুধু চিড়িয়াখানায় একটা-দুটো আছে?

— তাহলেও তো হতো। ওরা একেবারেই নেই। নাম না জানা আরও অনেক পশুপাখিও আজ লুপ্ত। কিছু মানুষ গণ্ডার মারে তার খড়্গের জন্য। হাতি মারে তার লম্বা দুটো দাঁতের জন্য।

— এগুলো খুব খারাপ কাজ। এমন অন্যায় করলে শাস্তি দেওয়া উচিত।

বলাবলি করে লেখো

তোমার অঞ্চলে কী কী পশুপাখি মারা হয়? কেন মারা হয়? এসব নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

পশুপাখির নাম	তাদের মারার কারণ	যাঁরা মারেন তাঁদের শাস্তি বিষয়ে তোমাদের মত

তা সে যতই কালো হোক

অজিতদের স্কুলে আসার পথে ইটখোলা পড়ে। সেখানে তিন লরি কয়লা এল। অজিত ও তার বন্ধুরা সবাই বুঝল, দশ-পনেরো দিনের মধ্যে ইট পোড়ানো শুরু হবে।

কয়লা দেখে অজিত বলল — এই কয়লা কোথা থেকে আসে জানিস?

দু-তিনজন একসঙ্গে বলল — রানিগঞ্জের কয়লা খনি থেকে।

—বর্ধমান শহর থেকে পশ্চিমে আরও আশি-নব্বই কিলোমিটার।

সবাই জানে অজিতের মামা কয়লাখনিতে চাকরি করেন।

অজিত সেখানে যায়। সেখানকার অনেক কিছুই জানে। তাই মনসুর বলল — কয়লাখনি কেমন রে? পুকুরের মতো? এখানে পুকুর কাটতে-কাটতে একসময় বালি বেরোয়। ওখানে তেমনি কয়লা বেরোয়?

— মামার কাছে শুনেছি সেরকম হয়। সেগুলোকে বলে খোলামুখ খনি। তবে বড়ো খনিগুলো খুব গভীর। সুড়ঙ্গ করা থাকে। সেখান দিয়ে ঢুকতে হয়। খানিকটা যাওয়ার পরেই চারিদিকে কালো। অবশ্য গাইডরা পথ দেখান।

— ইলেকট্রিকের আলো নেই?

— আছে। তবে চারিদিকে কালো কয়লা। আলোর জোর কি আর হয়?

— মেঝেটা সিমেন্টের?

—তা কি করে হবে? কয়লার মধ্যেই তো সুড়ঙ্গ। তার মেঝেও কয়লার। দেয়াল কয়লার। ছাদ কয়লার। আবার

এখানে সেখানে জল চুঁইয়ে পড়ছে। হাঁটার পথটা কাদা-কাদা মতন।

স্যার আসার পর আবার এসব কথা উঠল।

অজিত বলল— মামার কাছে শুনেছি, মামাকে প্রায়ই পাঁচশো মিটারেরও বেশি গভীরে নামতে হয়।

মনসুর বলল — আসানসোল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশো মিটার উঁচুতে। তোর মামাকে তো তাহলে প্রায়ই সমুদ্রের গভীরে চলে যেতে হয়!

মনসুরের কথায় সবাই হাসল। স্যার হেসে বললেন — সে তো বটেই। ওখানে ছ-শো মিটার গভীরেও কয়লা আছে। তোমরাতো জানো কয়লা হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ সম্পদ।

কেমন করে হলো কালো

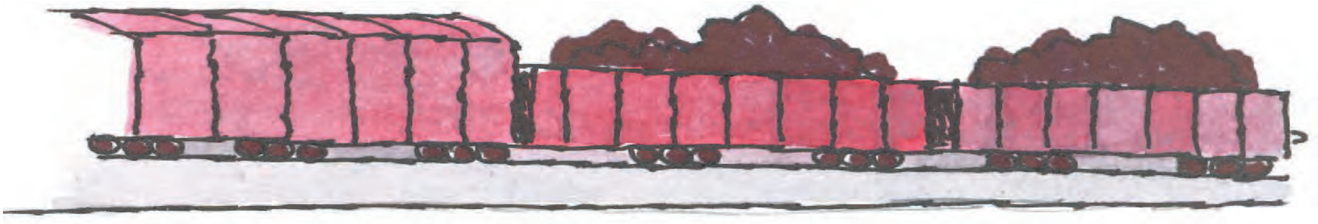

সাবিনা বলল— কত বড়ো হয় একটা খনি?

স্যার বললেন — ওই অঞ্চলে অনেক জায়গাজুড়ে অনেকগুলো কয়লাখনি। আসানসোল-রানিগঞ্জ-এর উত্তর-পূর্ব আর দক্ষিণ-পশ্চিমে খনিগুলো ছড়ানো। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায়ও কয়লাখনি আছে। প্রায় দেড়হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে এই কয়লাখনি অঞ্চল।

সাবিনা বুঝতে পারল না। অজিত বলল — ধর, একটা জায়গা ষাট কিলোমিটার লম্বা, পঁচিশ কিলোমিটার চওড়া। ষাট আর পঁচিশ গুণ কর। দেখবি জায়গাটার ক্ষেত্রফল দেড়-হাজার বর্গকিলোমিটার হবে।

স্যার বললেন — ঠিক বলেছ। তবে কয়লা খনি অঞ্চলটা অবশ্য ওইরকম আয়তাকার নয়।

কিন্তু মাটির নীচে এত কয়লা? এল কোথা থেকে? সাবিনা একথা জানতে চাইল।

স্যার বললেন — কাঠ-কয়লা কী করে হয় জানো?

ফরিদা বলল — হ্যাঁ, স্যার। জ্বলন্ত কাঠে জল দিতে হয়। কাঠ নিভে যায়। কিন্তু ওর মধ্যে জ্বালানি থেকে যায়।

অরূপ বলল— জ্বলন্ত কাঠটা বস্তা দিয়ে চাপা দিলেও নিভে যায়।

স্যার বললেন — তুমি কী ওভাবে কাঠ-কয়লা করেছ নাকি?

— হ্যাঁ, স্যার। ওইভাবে নেভালে সেই কাঠ-কয়লা দিয়ে তুবড়ি বানানো যায়।

—বেশ। ধরো, ভূমিকম্প হয়ে অনেক গাছপালা মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল। একশো বছর পরে ওই গাছপালার কাঠগুলোর কী হবে?

—মাটির নীচে চাপে আর জলে পচে যাবে?

পবন বলল —না, স্যার। কাঠের অসার অংশগুলো পচে যাবে। কিন্তু সার অংশগুলো পচবে না।

— তাহলে ওগুলোর কী হবে? ভাবো দেখি?

বলাবলি করে লেখো

মনে করো, কোনোভাবে বড়ো বড়ো অনেক গাছ চাপা পড়ে গেল। এক হাজার বছর পরে ওই গাছগুলোর কী হবে? নিজেরা আলোচনা করো। বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর লেখো:

এক হাজার বছর পরে গুঁড়ির সার অংশগুলো কী হবে	এক হাজার বছর পরে গুঁড়ির অসার অংশগুলো কী হবে

পুড়ে পুড়ে তাপ দিল, রইল পড়ে ছাই

পরের দিন। অরূপ বলল — ওই গাছগুলো অনেকদিন চাপা থাকলে কি কয়লা হয়ে যাবে? কাঠ-কয়লার মতো হবে? মাটি তো আর জ্বলে না। লোহাও জ্বলে না। কাঠ আর কয়লা জ্বলে। ওইভাবেই বোধহয় কয়লা তৈরি হয়েছে।

স্যারকে একথা বলতেই স্যার খুব খুশি হলেন। বললেন — এই তো বেশ আন্দাজ করেছ। তবে এক হাজার বছরে হয়নি। অনেক হাজার বছর আগে চাপা-পড়া গাছ থেকে কয়লা হয়েছে। প্রাণীদের হাড় থেকেও হতে পারে। কয়লার অনেকটা অংশই কার্বন। পশুপাখি-গাছপালা সব কিছুরই একটা প্রধান উপাদান ওই কার্বন।

---অনেকদিন ধরে পড়ে থেকে চাপে শক্ত হয়ে গেছে?

রুবি বলল — সার অংশটা জমাট হয়ে গেছে। আর সব কিছু পচে গেছে। তাই না, স্যার?

— হ্যাঁ। তবে শুধু চাপ নয়। মাটির নীচে গরমও খুব। চাপে আর তাপে এমন হয়েছে। কার্বন অংশটা জমাট হয়ে রয়ে গেছে। ওই কার্বন জমেই কয়লা।

—তাহলে কয়লা পুড়লে ছাই হয় কেন?

— সব কয়লায় বেশি ছাই হয় না। চাপে আর তাপে যত বেশিদিন থাকে, ততই অন্য জিনিস কমে যায়। কার্বন কমে না। ফলে কয়লায় কার্বনের ভাগ বেড়ে যায়। সেই কয়লা পোড়ালে ছাই খুব কম হয়।

— সেগুলো নিশ্চয়ই মাটির অনেক গভীরে থাকে। তাই না?

— ঠিকই বলেছ। কিন্তু কেন এমন ভাবছ?

আয়ুব বলল— গভীরে থাকলে বেশি চাপ পড়বে। আর গভীরে তো গরমও বেশি।

— বাঃ! এবারও ঠিক বলেছ। কিন্তু, একথা জানলে কী করে?

— টিভিতে আগ্নেয়গিরি দেখেছি। গরম লাভা বাইরে বেরিয়ে আসে। তাই মনে হলো মাটির গভীরে খুব গরম।

কয়লার ধোঁয়া: দূষণ

বাড়ি ফেরার পথে আয়ুব অজিতকে বলল — তোম মামা যখন কয়লাখনির সুড়ঙ্গে নামেন তখন শ্বাসকষ্ট হয় না?

--- সুড়ঙ্গের মধ্যে বাতাস পাঠানো হয়। কম্পিউটারে কত মাপামাপি! দরকার হলে অক্সিজেনও পাঠায়। বড়ো কিছু ভুল হওয়ার আগেই কম্পিউটারে ধরা পড়ে। অ্যালার্ম বেজে ওঠে।

কথা বলতে বলতে ওরা রেললাইনের পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছিল। ওখানে অনেক চেনা লোক থাকেন। বিকালে অনেকেই কয়লার উনুন জ্বালান। কেয়া বলল— দেখ না, কয়লার আঁচ থেকে কীরকম ধোঁয়া উড়ছে।

পরদিন ক্লাসে এসব কথা হলো। স্যার বললেন— ওই ধোঁয়া খুব বিষাক্ত।

কেয়া বলল — চোখে গেলে খুব চোখ জ্বালা করে। কাঠের ধোঁয়াতেও তাই হয়।

— দুটোরই তো একই উৎস। সবচেয়ে সমস্যা কী জানো? ধোঁয়ায় সালফারের অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড আর কার্বনের অক্সাইড গ্যাস থাকে। ওই গ্যাসগুলো বৃষ্টির জলে গুলে গিয়ে অ্যাসিড বৃষ্টি হতে পারে। এতে মাটি, গাছপালা, সৌধের নানা ক্ষতি হয়।

— তাই চোখ জ্বালা করে?

— হ্যাঁ চোখে একটু-আধটু ধোঁয়া লাগলে কিছু হবে না। কিন্তু যাদের চোখে রোজ লাগে তাদের চোখের ক্ষতি হবে।

অরূপ বলল — ওই ধোঁয়াতে কোনো বিষাক্ত গ্যাস আছে?

— একটা বিষাক্ত গ্যাস তো আছেই। কার্বন মনোক্সাইড। এছাড়াও ধোঁয়ায় অনেক গুঁড়ো জিনিস থাকে।

— সেগুলো শ্বাসে গেলেও তো ক্ষতি!

— ক্ষতির আরও অনেক কিছু থাকে ধোঁয়ায়। এসব নিয়ে বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলো। বাড়িতে, পাড়ায় আলোচনা করো।

বলাবলি করে লেখো

কয়লার ধোঁয়া থেকে কীভাবে ক্ষতি হয়? আলোচনা করে লেখো।

ঘটনা	কী ক্ষতি / কীভাবে ক্ষতি
চোখে ধোঁয়া লাগলে	
শ্বাসের সঙ্গে দেহের ভেতর ঢুকলে	
সৌধ বা স্থাপত্যের ওপর প্রভাব	
গাছের পাতার ওপর প্রভাব	
বৃষ্টির জলের মাধ্যমে মাটির ওপর প্রভাব	

ধস না নামে যেন

নিতাইদের পাড়াটা একটা মজে যাওয়া নদীর ধারে। বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে নিতাই। হঠাৎ দেখল নদীর দিকটায় অনেক লোক। কী ব্যাপার? সুভাষকাকা বললেন— একটা ছেলে পড়ে গেছে। ছেলেটা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল। বুঝতে পারেনি যে ভিতর থেকে বালি কাটা হয়েছে। উপরের মাটি ধসে বাচ্চাটা গর্তে পড়ে গেছে।

নদীর পাড়ের উপরের দিকে একটু মাটি। তার নীচে বালি থাকে। বাড়ির মেঝে তৈরি করতে বালি লাগে। তখন ওই মাটির নীচের বালি তুলে নেয় লোকজন।

বীণা দিদা বললেন —ছেলেটার বেশি লাগেনি। কিন্তু ভিতর থেকে এমনতরো বালি কেটে নিলে মাটি তো ধসে পড়বেই!

নিতাই ভাবল, কয়লাখনিতে কয়লা তুলে নিলে কী হবে? ওদিকেও তো অনেক জায়গায় উপরে মাটি। ভিতর থেকে আগেই কয়লা তুলে নিয়েছে। সেখানেও তো এভাবে মাটি ধসে যেতে পারে!

পরের দিন নিতাই একথা ক্লাসে সবাইকে বলল।

অজিত বলল — ওই ফাঁকা জায়গাগুলো বালি দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়। অবশ্য মাটি আলগা থেকে যায়।

স্যার বললেন— সেজন্য খনি অঞ্চলে গাছ লাগানো খুব দরকার। শিকড়গুলো যাতে মাটির নীচে জালের মতো ছড়ায়।

নিতাই বলল — বুঝেছি। তাহলে ধসের ভয় কমে!

— কয়লা তুলে বালি দিয়ে ভরাট করা হয়। গাছও লাগানো হয়। তবু ধস নামে। একটা-দুটো নয়। অনেক জায়গায় ধস নেমে বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণে খনি থেকে সব কয়লা তোলা যায় না। কিছু খনি থেকে হয়তো একটু বেশি কয়লা তোলা হয়ে গেছে। সেখানেই ধস নামে।

বলাবলি করে লেখো

কয়লাখনি অঞ্চলের ধসের সমস্যা মোকাবিলা করা যায় কীভাবে? লেখো, ছবি আঁকো:

সমস্যা মোকাবিলায় কী করা যায়	ছবি

কম-গরম আগুন, বেশি-গরম আগুন

স্যার ক্লাসে আসতেই অজিত জানতে চাইল, সব আগুন একই রকম গরম কিনা।

স্যার বললেন— সব আগুন একরকম গরম নয়। গরমের কমবেশি আছে। কিছু কাজে কম গরম আগুন হলে চলে। যেমন রান্না।

খালেদা বলল— কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে গুল বানিয়েও রান্না করা যায়।

— ঠিক, কম কার্বন আছে এমন কয়লার আগুনে রান্নার কাজ চলবে। কিন্তু যদি খুব গরম আগুন লাগে? তাহলে কয়লা আরও খাঁটি হওয়া চাই। খুঁজতে হবে কোন কয়লায় কার্বন বেশি!

অজিত বলল— কিন্তু, কী কাজে অত গরম আগুন লাগে?

— লোহা-ইস্পাতের কারখানায় লোহা গলাতে হয়। সেখানে লাগে। তাছাড়া বিদ্যুৎ তৈরি করতে লাগে।

— বিদ্যুৎ দিয়ে সব কাজ করা যায়। আলো জ্বলছে। পাখা চলছে। টিভি, কম্পিউটার সব চলছে।

রুবি বলল— দাদু বলে, তোমার যখন আমার মতো বয়স হবে, তখন পেট্রোল-ডিজেল ফুরিয়ে যাবে। তখন বাসও হয়তো বিদ্যুৎ দিয়ে চলবে।

আয়ুব বলল— কয়লা না হয় ফুরোবে। যা জমা আছে সেটুকুই আছে। পেট্রোল-ডিজেল কী করে ফুরোবে?

স্যার বললেন— পেট্রোল-ডিজেলও কয়লার মতো।

এই বলে স্যার বোর্ডে এবিষয়ে লিখে দিলেন—

সবাই পড়ল। আয়ুব বলল— তাহলে তো দুটোই ফুরিয়ে যাবে।

পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোল-ডিজেল -কেরোসিন হয়। পেট্রোলিয়াম থকথকে, কাদা কাদা। মাটির নীচেই পাওয়া যায়। গাছের থেকে যেভাবে কয়লা হয়েছে, সেভাবে প্রাণীদেহ থেকেই পেট্রোলিয়াম হয়েছে। কয়লা পেট্রোলিয়াম দুটোকেই বলে জীবাশ্ম জ্বালানি।

স্যার বললেন--- তবে পেট্রোলিয়াম হয়তো আগে ফুরোবে। কয়লা তারপরেও চলবে। কিন্তু কয়েকশো বছর পরে তাও হয়তো ফুরোবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের এলাকায় পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন, বিদ্যুৎ কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়? আলোচনা করে লেখো:

পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন কী কী কাজে ব্যবহার হয়	বিদ্যুৎ কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়

নানাভাবে বিদ্যুৎ

স্কুল থেকে ফেরার সময় সবাই রুবিকে ধরল। পেট্রোল-ডিজেলের পর কয়লাও তো ফুরিয়ে যাবে! তখন বিদ্যুৎশক্তিই বা কী করে হবে? রুবি চিন্তায় পড়ে গেল।

পরদিন ক্লাসে রুবি জানতে চাইল— স্যার, বিদ্যুৎ দিয়ে এত কিছু হয়। আর বিদ্যুৎ হয় শুধু কয়লা দিয়েই?

স্যার হেসে বললেন--- কয়লা ছাড়াও বিদ্যুৎ হয়। বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটা মস্ত পাখার মতো দেখতে একটা যন্ত্র থাকে। এটা টারবাইন। সেটা

ঘোরাতে হয়। সে বাষ্পের চাপে ঘোরাও, আর সবাই মিলে ঠেলে ঘোরাও! যে ঘোরাবে, তার শক্তির একটা অংশই বিদ্যুতের শক্তি হয়ে আসে।

অনেকেই ঠিকমতো বুঝতে পারল না। তখন স্যার আবার বললেন — ডায়নামো লাগানো সাইকেল দেখেছ তো? অজিত বলল — বুঝেছি। ডায়নামো চালু করলে প্যাডেল করতে একটু বেশি খাটনি হয়। তবে প্যাডেল করা যাবে।

রুবি বলল– ডায়নামোতে ছোটো একটা বালব জ্বলবে। জেনারেটরে বরং অনেক আলো জ্বলে।

— জেনারেটর কোথায় দেখেছ?

– যাত্রার সময়। হয়তো রাজা বিচার করছেন। এমন সময় লোডশেডিং হলো। দর্শকরা হই হই করে উঠল। দু-মিনিটের মধ্যে জ্বলে উঠল জেনারেটরের আলো। আবার বিচার শুরু হলো।

রুবির কথা শুনে সবাই খুব হাসল।

— ওই জেনারেটর ডিজেলের শক্তিতে চলে। বিদ্যুৎকেন্দ্রে আরও বড়ো পাখা ঘোরাতে হয়।

আকাশ বলল - পাহাড়ি নদীর জলে তীব্র স্রোত। তার মুখে পাখাটা ধরতে পারলে খুব ভালো হতো।

— সেটাই করা হয়। তাকে বলে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা। একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে ভুটানের কাছে ঝালং-এ। জলঢাকা নদীর জলস্রোতের শক্তিতে চলে সেটা।

আয়ুব বলল — জলের স্রোত তো আর শেষ হবে না?

স্যার এর উত্তর দিলেন না। শুধু হাসলেন আর বললেন — জল নিয়ে তো কত কথা হয়েছে। এবার নিজেরা ভাবো, আলোচনা করো।

জলের স্রোত, সূর্যের তাপ

পরদিন। আকাশ বলল— জলের স্রোতটা কী করে হচ্ছে বলত?

পরাগ বলল— সূর্যের তাপে বরফ গলে যাচ্ছে। তাই জল হচ্ছে।

—বরফ জমছে কেন?

— সূর্যের তাপে পুকুর-নদী-সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে গিয়ে ঠান্ডা হচ্ছে।

অজিত বলল— তাহলে দেখ, সূর্যের তাপেই সব হচ্ছে। সূর্যের তাপ ছাড়া জল বাষ্প না হলে পর্বতে বরফ হতো না। আবার সূর্যের তাপ ছাড়া তা গলতও না।

রুবি বলল—মনে হচ্ছে, সূর্যের তাপ থাকলে জলের প্রবাহও থাকবে। স্যারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ওদের কথা শুনে স্যার বললেন— তাহলে আয়ুব নিশ্চিন্ত।

সূর্য থাকলে পর্বত থেকে নদী আসবে। জলের প্রবাহও থাকবে।

আয়ুব বলল — আসলে কিন্তু শক্তিটা সূর্যই দিচ্ছে। তবে একটু ঘুরপথে। জলের মাধ্যমে।

— এটাকে বলে জলচক্র। ছবি দেখে ভালো করে বুঝে নাও।

সবাই ছবিটা দেখল। জল বাষ্প হচ্ছে। আবার বরফ গলে জল হচ্ছে। সবাই বুঝল সূর্য আমাদের কত দরকারি।

খানিক পরে আয়ুব বলল — সূর্যের শক্তি সরাসরি কাজে লাগানো যায় না?

— রোজ কত কাজে লাগাও। কাপড় কেচে শুকোও। ধান শুকোও। আর কী কী করো?

সবাই আরও অনেক কিছু বলতে শুরু করল। স্নানের জল গরম করা, রোদ পোহানো, কোথায় কী আছে তা দেখা।

আয়ুব বলল— সূর্যের আলো দিয়ে বিদ্যুৎ করা যায় না?

— তাও করা যায়। সূর্যের আলো সোলার প্যানেলে ফেলে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা হয়। তা দিয়ে ক্যালকুলেটর চলে। অনেক খেলনা ঘোরে। আরো অনেক কিছু হয়তো দেখেছ। কিন্তু বড়ো বড়ো বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো হচ্ছে, এমন কেউ দেখেছ?

প্রচলিত শক্তি, অপ্রচলিত শক্তি

পরদিন নাসরিনের মনে পড়ল দিদির কলেজের কথা। হস্টেলের সামনে সোলার লাইট আছে। টেবিলের মাপের সোলার প্যানেল। কাচ দিয়ে ঢাকা, খানিকটা উঁচু। একটু দক্ষিণে হেলিয়ে রাখে। দিদি বলেছিল, সারাদিন ধরে রোদে ব্যাটারি চার্জ হয়। দিনের আলো কমে গেলেই জ্বলে ওঠে। ক্লাসে নাসরিন এসব বলল।

স্যার বললেন — ওটাই সৌরবিদ্যুৎ। সূর্যের আলো সোলার প্যানেলে ফেলে পাওয়া যায় বিদ্যুতের আলো। ওটা এখনও তেমন প্রচলিত নয়। তাই এটাকে বলে অপ্রচলিত শক্তি।

আয়ুব বলল—পেট্রোলিয়াম ও কয়লা ব্যবহার করে যে শক্তি পাওয়া যায় তা কি প্রচলিত শক্তি?

— হ্যাঁ, ওগুলো প্রচলিত শক্তি। জলবিদ্যুৎ-ও প্রচলিত। তবে জলবিদ্যুৎ বারবার ব্যবহার করা যায়। শেষ হবে

না। কিন্তু অন্য দুটো ফুরিয়ে যাবে। জলপ্রবাহের মতো বায়ুপ্রবাহের শক্তি দিয়ে পাখা ঘুরিয়েও বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। রোদ ব্যবহার করে রান্নাও করা যায়। সেই যন্ত্রকে বলে সোলার কুকার। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পচা, আধ-পচা বর্জ্য ব্যবহার করে জৈব গ্যাস করা যায়। তা দিয়েও রান্না করা যায়। জোয়ারের জল কাজে লাগিয়েও শক্তি উৎপন্ন করা যায়।

অরূপ বলল — উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বর্জ্য তো রোজই পাওয়া যাবে!

পরাগ বলল— এগুলো অপ্রচলিত রয়েছে কেন?

— এগুলোয় শুরুতে একটু বেশি খরচ হয়। চেষ্টা করা হচ্ছে এসব খরচ কমানোর। কোনোটা দিয়ে আবার কাজ করতে সময় বেশি লাগে। এসব ব্যবহারের সহজ পদ্ধতি বের করার চেষ্টা চলছে।

— বুঝেছি। মানুষ একটু একটু করে সহজ পদ্ধতিগুলো আবিষ্কার করবে।

বলাবলি করে লেখো

১। সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে কোন কোন যন্ত্র চলে? কে কী দেখেছ আলোচনা করে লেখো :

যন্ত্রের নাম ও ছবি	যন্ত্রের নাম ও ছবি	যন্ত্রের নাম ও ছবি	যন্ত্রের নাম ও ছবি

২। অপ্রচলিত শক্তি কোনগুলো? কেন তাদের অপ্রচলিত বলছ? কীভাবে তারা প্রচলিত হবে? আলোচনা করে লেখো :

অপ্রচলিত শক্তির নাম	কেন অপ্রচলিত বলা হচ্ছে	কীভাবে তারা প্রচলিত হবে বলে মনে হয়

চলাফেরার সেকাল একাল

স্কুল থেকে ফিরছে সবাই। একটু দূরে পাকা রাস্তা। একটা বাস গেল। বেশ ভিড়। সবাই দেখল। বিশু বলল — যখন বাস ছিল না, তখন মানুষ কীভাবে দূরে যেত?

অরূপ বলল— ঘোড়া ছিল। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া সহজ নয়। তাছাড়া ঘোড়া পোষার অনেক খরচ।

— গোরুর গাড়ি ছিল। ঠাকুরমার কাছে শুনেছি।

— জানি। এখনও তো আছে। মাঠ থেকে ধান তুলে আনে। তাতে কি দূরে যাওয়া সম্ভব?

নাসরিন বলল— সময় অনেক বেশি লাগত। লোকে বেশি দূরে যেতও না।

পরদিন ওরা স্যারকে এসব বলল। স্যার বললেন — তারপর পালকি এল। চারজন লোক কাঠের পালকি বইত। তার ভিতরে এক বা দুজন মানুষ বসত।

— এক-দুজন মানুষকে চারজন মিলে বইত? নিশ্চয়ই অনেক ভাড়া লাগত?

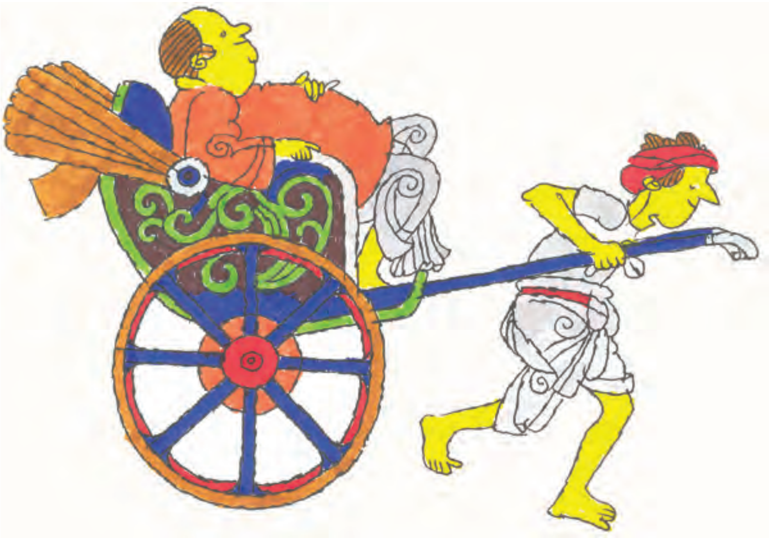

--- তা ঠিক। কলকাতায় ঘোড়ায় টানা গাড়িও ছিল। কিন্তু সেটারও বেশ খরচ ছিল। সাধারণ লোক হেঁটেই যেতেন। দূরে যেতে হলে বয়স্করা গোরুর গাড়িতে যেতেন। বাচ্চারাও সেই গাড়িতে উঠে পড়ত। মালপত্রও তাতে তুলে দেওয়া হতো।

— শুধু ঘোড়া আর গোরুর গাড়ি? অন্য কোনো পশু পরিবহনে কাজে লাগত না?

— কেন লাগাবে না? সুযোগ পেলেই মানুষ পশুর পিঠে চড়ে বসত। হাতির পিঠে চড়া, উটের পিঠে চড়া প্রচলিত ছিল। তবে হাতি পোষা অনেক খরচ। উটও কম খরচ নয়। গাধার পিঠে মাল নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। মানুষও গাধার পিঠে চড়ত।

নাসরিন বলল — রিকশা তখন ছিল না? রিকশা কবে হলো?

বিশু বলল— দাদু বলছিল আগে দু-চাকা রিকশা ছিল। মানুষ টানত!

— হ্যাঁ। আগে রিকশা মানুষই টানত। রিকশা ১৯০০ সালে কলকাতায় আসে। তখন জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগত। ১৯১৪ সাল থেকে মানুষ বওয়ায় ওই রিকশা ব্যবহার শুরু হয়।

বলাবলি করে লেখো

আগেকার দিনের এইসব পরিবহণের কোন কোনটায় চড়েছ বা দেখেছো বা চড়ার কথা শুনেছো? কোথায়? কেমন লেগেছে? এসব নিয়ে লেখো :

আগেকার পরিবহণের কোন কোনটায় চড়েছো/ দেখেছো/চড়ার কথা শুনেছো	কোথায় চড়েছ	কেমন লেগেছে (ব্যথা/ ঝাঁকুনি/ভয়/ আরাম)	কতটা পথ যেতে কেমন খরচ হয়েছে	ওই পরিবহণ বিষয়ে আর যা বলতে চাও

নদীর উপর ভেসে চলা

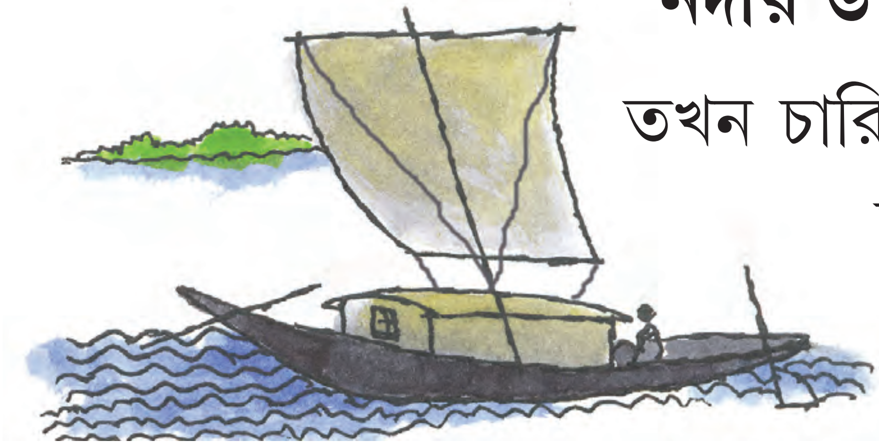

তখন চারিদিকে বন। মাটির উপর রাস্তা কম। ঘোড়ায় চেপেও ভয়ে ভয়ে যাওয়া। বন্য জন্তু আক্রমণ করতে পারে। অন্য লোকেরা আক্রমণ করতে পারে। সে তুলনায় নদীর জল ভালো। নদীতে জল থাকত অনেক বেশি। আর জলের উপর কী ভাসে তা মানুষ অনেক আগেই জেনে গেছিল। তাই অনেক আগে থেকেই জলের উপর দিয়ে ভেলায় চেপে যেত। তারপর নানা রকমের নৌকা, পানসি তৈরি করেছিল। নিজেরা যেত। মালপত্র নিয়ে যেত।

স্যার নিজেই এসব বলার পর আয়ুব বলল - স্যার, পানসি কী?

– ডিঙিনৌকার মতোই। তবে আরো লম্বাটে, হালকা।

পাল খাটানো। হাওয়া লাগলে খুব জোরে যেতে পারে। খুব সাবধানে হাল ধরতে হয়।

অজিত বলল — হাল কী?

আয়ুব বলল — জানিস না? হাল অনেকটা সাইকেলের হ্যান্ডেলের মতো। নৌকা কোন দিকে যাবে তা ঠিক করবে হাল।

— আর পাল?

— পালে বাতাস আটকায়। বাতাস নৌকাকে টেনে নিয়ে যায়।

অজিত ঠিক বুঝতে পারল না। তা দেখে স্যার বললেন—

ধরো, তুমি হয়তো ঝড়ের মধ্যে সাইকেলে যাচ্ছ। সাইকেলের হ্যান্ডেল শক্ত করে না ধরলে কী হয়?

— সাইকেল রাস্তায় রাখা যায় না। পাশের নালার দিকে চলে যায়।

— তাহলে বোঝ। নৌকার পালে হাওয়া ধরেছে, অথচ ঠিকমতো হাল ধরা নেই। তাহলে কী হবে?

— বুঝেছি। হালটা ঠিকঠাক না ধরলে নৌকা উলটে যাবে।

আয়ুব বলল — খেয়া পারাপারের নৌকা দাঁড় টেনেই চলে।

— ঠিক বলেছ। দাঁড় টেনে জল পিছিয়ে দিতে হয়। তবে নৌকা এগোতে পারে।

অজিত বলল — ওই নৌকা বেশি জোরে যেতে পারে না।

আয়ুব বলল — জোরে চালানোর জন্য লঞ্চ বা স্টিমারে,

ভুটভুটিতে ডিজেল ইঞ্জিন লাগানো থাকে। পাল থাকে না। দাঁড় থাকে না।

— ওগুলোতে হাল থাকে তো?

— অবশ্যই। না হলে চলার সময় দিক ঠিক রাখবে কী করে?

বলাবলি করে লেখো

১। যারা নৌকা, লঞ্চ বা ভুটভুটিতে চড়েছ, সে বিষয়ে লেখো:

কোথায় নৌকা চড়েছ	কী ধরনের নৌকা	কেন চড়েছ	নৌকায় আর কারা ছিলেন/ কী মালপত্র ছিল	নৌকায় দাঁড় ও হাল ছিল কিনা, না থাকলে কী কী ছিল

২। নৌকা, লঞ্চ বা ভুটভুটিতে চড়া এবং মালপত্র নেওয়া বিষয়ে যা দেখেছ বা পড়েছ তার ভিত্তিতে পছন্দমতো যে কোনো জলযানের ছবি আঁকো:

তোমার এলাকার যানবাহন

ফেরার সময় ইলিয়াস বলল - আগেকার অনেক যানবাহন এখনও আছে। আবার আরও অনেকরকম যানবাহন এসেছে।

সুনীল বলল - কোন রাস্তায় কী চলে তা তো জানি। মানচিত্র দিয়ে দেখানো যাবে?

অজিত বলল - আমি চেষ্টা করব। যদি পারি কাল তোদের দেখাব।

পরদিন অজিত স্থানীয় পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র এঁকে দেখাল। স্যার নিজে একটু দেখে সবাইকে দেখালেন।

সবাই মানচিত্র দেখতে লাগল। অজিত বলল - চওড়া পিচ রাস্তাটা পশ্চিমে আর উত্তরে। খালটা গেছে পূর্ব দিক দিয়ে।।

ইলিয়াস বলল - সে তো নৌকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

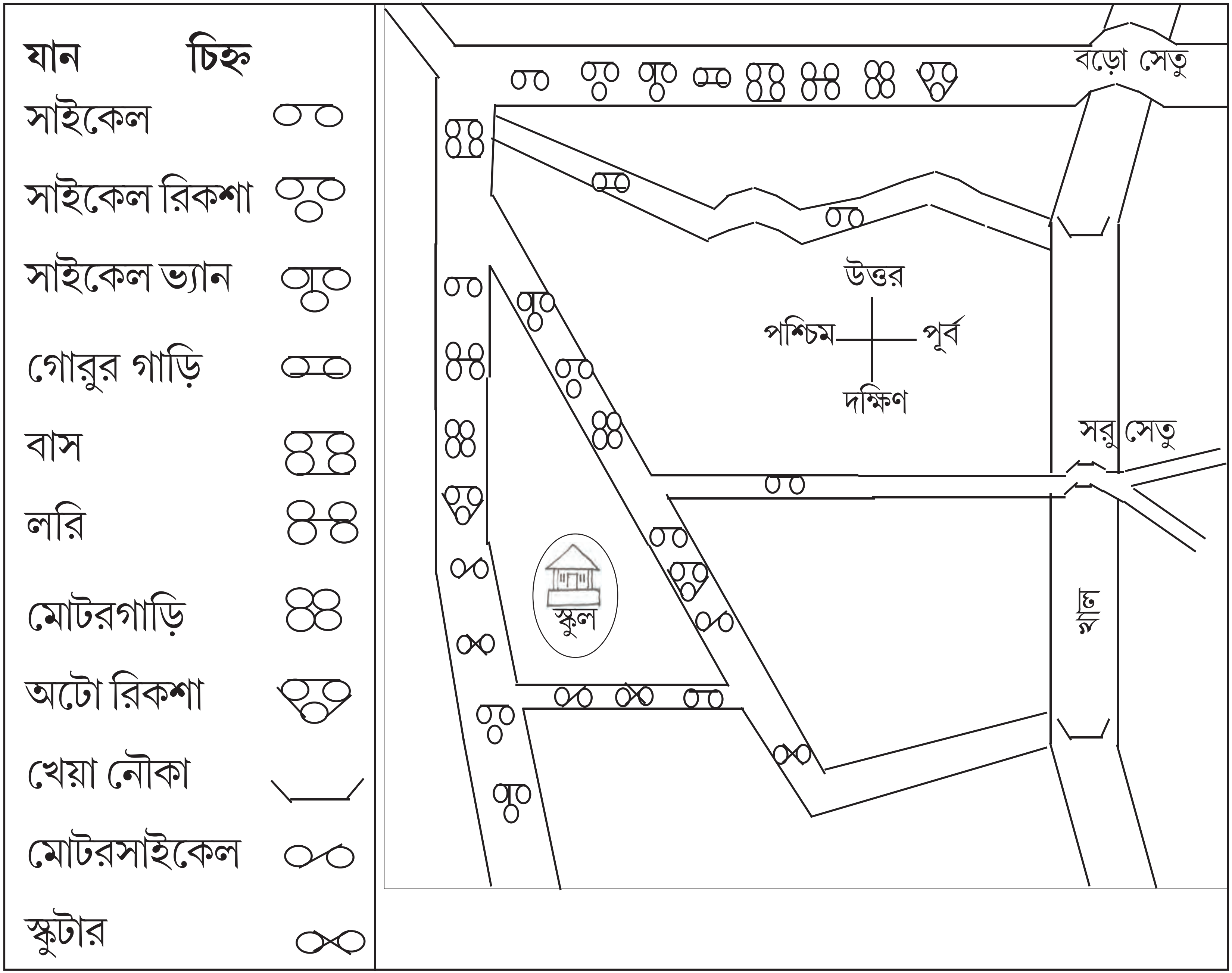
যান
চিহ্ন
সাইকেল
সাইকেল রিকশা
সাইকেল ভ্যান
গোরুর গাড়ি
বাস
লরি
মোটরগাড়ি
অটো রিকশা
খেয়া নৌকা
মোটরসাইকেল
স্কুটার
বড়ো সেতু
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
সরু সেতু
স্কুল
নদী

নাসরিন বলল - দেখ, বড়ো রাস্তায় গোরুর গাড়ি চলে না। শুধু উত্তর দিকের ঘাট থেকে বড়ো রাস্তায় গোরুর গাড়ি যায়।

অরূপ বলল - দক্ষিণ দিকের খেয়াঘাটের রাস্তায় অনেক কিছু যায়। বাস-লরি চলে না। গোরুর গাড়ি চলে না।

পিন্টু বলল - দুটো খেয়ার মাঝের রাস্তা দিয়ে শুধু সাইকেল যায়? স্কুটার, মোটর সাইকেলও যায় না?

অজিত বোঝাল – সরু সেতু। তায় বাঁশের, আর পুরোনো হয়ে গেছে।

স্যার বললেন— বেশ, বেশ। বলো দেখি সমস্ত রাস্তায় কোন যান যেতে পারে?

খানিকক্ষণ দেখে দু-তিনজন একসঙ্গে বলল--- সাইকেল।

— ঠিক বলেছ। সাইকেল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা যান। দশ-পনেরো কিলোমিটার যাতায়াতে সাইকেল পরে খুব দরকারি হবে।

দেখে বুঝে লেখো

১। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলের পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র আঁকো। পছন্দমতো চিহ্ন ঠিক করে নাও:

২। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি কী কী যানবাহন চলে? বাড়ির চারপাশে কয়েকদিন ধরে লক্ষ করো। তারপর লেখো:

কবে দেখেছ (তারিখ)	কখন দেখেছ (ক-টা থেকে ক-টা)	বাড়ির কোন দিকে দেখেছ	কী কী যান দেখেছ ও তাদের সংখ্যা কত

পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ: সাইকেল

স্যার বলেছিলেন, ভবিষ্যতে সাইকেল খুব দরকারি হবে। কিন্তু কেন? কেউ ভেবে পেল না। শেষে স্যারের কাছেই জানতে চাইল।

স্যার বললেন— গাড়ি চললে ধুলো-ধোঁয়া হয়, তাই না?

অজিত বলল—গাড়ি নতুন থাকলে ততটা ধোঁয়া হয় না। পুরোনো হয়ে গেলে খুব ধোঁয়া হয়।

অরূপ বলল— কয়লার ধোঁয়ার মতো গাড়ির ধোঁয়াতেও বিষাক্ত গ্যাস আছে।

কেয়া বলল— হয়তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। পাশের লরিটা ছাড়ল। কালো ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেল।

— শহরে তো রাস্তায় জ্যাম। সারাক্ষণই গাড়ি থামছে আর ছাড়ছে। বাতাসের সব জায়গায় বিষাক্ত গ্যাস ছড়াচ্ছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে। আরও নানারকম বিষাক্ত গ্যাস।

রুবি বলল— গাড়ির ধুলোয়ও গাছের খুব ক্ষতি হয়। পাতায় ধুলো জমে কালো হয়ে যায়।

— ওই পাতা ঠিকমতো খাদ্য তৈরি করতে পারবে না। ধুয়ে দিলে ভালো হয়।

--- বৃষ্টি হলে পাতা ধুয়ে যায়। তখন গাছ আবার লকলকিয়ে বাড়ে।

— রাস্তায় গাড়ির তেল-মবিল পড়ে। বৃষ্টিতে তা ধুয়ে যায় চাষের খেতে। এতেও মাটির ক্ষতি হয়। ফসল কমে যায়।

— পুকুরেও বৃষ্টির জল ধুয়ে যায়। পুকুরের মাছের ক্ষতি হয় না?

— হয় তো!

--- বুঝেছি, সেজন্য ভবিষ্যতে সাইকেল বাড়বে। সাইকেল চললে বাতাসের দূষণ হবে না!

ইলিয়াস বলল — কিন্তু প্যাডেল করায় কষ্ট হয়। সবাই তো আরাম চায়। মোটরবাইক চায়। তারা কী আর এসব ভাববে!

— অবশ্যই। সকলকেই ভাবতে হবে।

মিনিটখানেক সবাই চুপ করে থাকল। তারপর নানা জন নানা কথা বলতে লাগল।

— রাস্তায় এত গাড়ি। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

— মানুষের সময় কম। সাইকেলে কী করে যাবে?

— পাশে অনেকে গাড়িতে যাবে। তাদের গাড়ির ধোঁয়াটা

লাগবে। সাইকেলে যে যাচ্ছে তার মুখেই লাগবে।

- এসব সত্যি কথা। তবে এর সমাধানও ভাবা যায়। কিন্তু আর একটা সত্যি হল খনিতে জমা পেট্রোলিয়াম কমে যাচ্ছে। এর কোনো সমাধান নেই। ফলে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়তেই থাকবে।

ইলিয়াস বলল --- কলকাতায় ট্রাম আছে। ট্রেনের মতোই, তবে ছোটো। বিদ্যুৎশক্তিতে চলে। তাতে তো দূষণ কম।

রুবি বলল — ঠিক। তাহলে ট্রাম আর ট্রেন চালাতে হবে!

— সেটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু সর্বত্র বিদ্যুতের লাইন যাবে না। তাই বিদ্যুৎচালিত বাইক, চার চাকা গাড়ি এসবও থাকবে। তবে সাইকেলও বাড়াতে হবে।

বলাবলি করে লেখো

সাইকেল চালানো আরও সহজ করার জন্য রাস্তার সমস্যাগুলো কীভাবে কমানো যায়? ভাবো। আলোচনা করো। তারপর লেখো :

অ্যাকসিডেন্টের সমস্যা	
মানুষের কম সময়ের সমস্যা	
অন্য গাড়ির ধোঁয়ার সমস্যা	
অন্য সমস্যা যা কেউ বলেনি	

পথের পাঁচালি

সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও

এক সপ্তাহের জন্য তিতলি কলকাতায় বেড়াতে গেছে। ওর কাকু কলকাতায় থাকেন। ভাই আর বোন আছে সেখানে। দারুন খুশি তিতলি। ঘোরা হবে, খেলা হবে। সবাই মিলে ঠিক করা হলো ওরা রোজই ঘুরতে যাবে। পায়ে হেঁটে ঘুরবে কলকাতার নানা জায়গা। গাড়িতেও ঘুরবে। কাকু নিজেই গাড়ি চালান। তিতলি দাদুর মুখে শুনেছিল কলকাতা একসময় ভারতের রাজধানী ছিল। এতো বড়ো বড়ো উঁচু বাড়ি তিতলি আগে দেখেনি। আর রাস্তায় এতো লোক ও গাড়িও এই প্রথম দেখল। আজ ওরা পায়ে হেঁটে ঘুরছে। মনুমেন্ট বা শহিদ মিনার দেখে তিতলি অবাক হলো। কত লম্বা একটা মিনার। সেখান থেকে বেরিয়ে একটা বিরাট রাস্তা। তার নানা দিক থেকে গাড়ি চলছে। কাকু আর কাকিমা ওদের তিন ভাইবোনের হাত শক্ত করে ধরলেন। কাকিমা বললেন, খুব খেয়াল করে রাস্তা পেরোতে হয়। কখনও তাড়াহুড়োয় বেখেয়ালে রাস্তা পার হতে নেই।

তিতলি দেখল সিগন্যাল লাল হতেই গাড়িগুলো থেমে গেল। সিগন্যালে একটা মানুষের ছবি জ্বলে উঠল। সেটা দেখেই ওরা জেব্রা ক্রসিংয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে রাস্তা পেরোল। রাস্তা পার করেই আবার ফুটপাথে উঠল। কাকু বললেন, সবসময় ফুটপাথ ধরে হাঁটবে। রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটবে না। মোবাইল ফোন কানে দিয়ে রাস্তা পেরোবে না। তিতলি দেখল একটা মজার পোস্টার। তাতে

লেখা আছে ট্র্যাফিক নিয়ম খুব সোজা। তার জন্য মোটা বই পড়ার দরকার নেই। রাতে শুতে যাওয়ার সময় খাতায় বেড়ানোর কথা লিখল তিতলি। সঙ্গে লিখল, হাঁটার জন্য ফুটপাথ, গাড়ির জন্য রাস্তা।

পরেরদিন ওরা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরোল। কাকু ও কাকিমা সামনে বসলেন। তিতলির ভাই পাপান সামনে বসতে চাইল। কাকিমা বললেন, ছোটোদের সামনে বসা

উচিত নয়। কাকু বললেন, সিটবেল্ট না লাগিয়ে গাড়ি চালাতে বা বসতে নেই। গাড়ি চালানোর নানা নিয়ম বলছিলেন কাকিমা। যেমন বললেন, স্কুল, হাসপাতাল এসবের সামনে জোরে গাড়ি চালাতে নেই। আর হর্ন বাজানোও ঠিক নয়। যে রাস্তায় অনেক লোক সেখানে আস্তে গাড়ি চালানো উচিত।

একটা জায়গায় তিতলি দেখল ট্রাফিক পুলিশ ওদের হাত দেখাচ্ছে। সামনে আরও কটা গাড়ি। কাকু গাড়ি থামালেন। পুলিশ কাকুর কাছে কী একটা দেখতে চাইলেন। কাকু একটা কার্ড বার করে দিলেন। পুলিশ সেটা দেখে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। গাড়ি আবার চলল। কাকু বললেন, উনি লাইসেন্স দেখতে চাইলেন। তিতলি বলল, লাইসেন্স কী? কাকিমা বললেন, গাড়ি চালানো শিখতে হয়। সেটা ঠিকমতো শিখে পরীক্ষা দিতে হয়। পাশ করলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বা গাড়ি চালানোর

ছাড়পত্র দেওয়া হয়। রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় লাইসেন্স সঙ্গে রাখতে হয়। ট্রাফিক পুলিশরা দরকারে লাইসেন্স যাচাই করেন। রাস্তার মোড়ে এসে লাল সিগন্যাল পেল তিতলিরা। কাকু জেব্রা ক্রসিংয়ের আগেই গাড়ি দাঁড় করালেন। একটা গাড়ি এগিয়ে গিয়ে ক্রসিংয়ের ওপরে দাঁড়াল। ট্রাফিক পুলিশ সেই গাড়িটাকে পেছিয়ে যেতে বললেন। তিতলি ভাবল, তাইতো, গাড়ি যদি জেব্রা দাগের ওপরে

দাঁড়ায়, তবে লোকে পেরোবে কী করে। খানিক দূরে গিয়ে তিতলি দেখল একটা ব্রিজ। তার ওপর দিয়ে লোক চলাচল করছে। কাকিমা বললেন, এটা হলো ফুটব্রিজ। অনেক রাস্তায় লোক চলাচল মানা। সেখানে ফুটব্রিজ ব্যবহার করতে হয়। আবার অনেক সময় রাস্তার নীচদিয়ে সুড়ঙ্গের মতো সাবওয়ে থাকে। ফুটব্রিজ, সাবওয়ে ব্যবহার না করে রাস্তা পেরোতে গেলে দুর্ঘটনা হতে পারে।

নীচের কোনগুলি পথ সুরক্ষার বিরোধী তা চিহ্নিত (✓) করো :

১. মোটর সাইকেলে হেলমেটবিহীন আরোহী

২. চলন্ত গাড়ি বাঁদিক থেকে ওভারটেক করছে

৩. দুটো বাসের রেষারেষি

৪. বাসে ঝুলন্ত অবস্থায় যাওয়া

৫. মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালানো/রাস্তা পারাপার

৬. রেলওয়ে ক্রসিং ও সিগন্যাল যা দেখে রাস্তা পারাপার

৭. চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পারাপার

৮. ধূমপানরত ড্রাইভার

৯. রাস্তার কলার খোসা ছোড়া

১০. রাস্তায় পোড়া মোবিল পড়ে থাকা

সারাদিন ঘোরার ফাঁকে খাওয়া দরকার। রাস্তার পাশে একটা জায়গায় সার বেঁধে গাড়ি দাঁড়িয়ে। তারই একপাশে আস্তে করে গাড়িটা রাখলেন কাকু। তিতলি দেখল সেখানে লেখা আছে, এখানে গাড়ি রাখুন। ও বুঝল যেখানে সেখানে গাড়ি রাখা উচিত নয়। একটা বিরাট মাঠে বসল ওরা। রিয়া বলল, জানিস তিতলি এটা গড়ের মাঠ। কী বিরাট মাঠ। দেখেই তিতলির ভালো লেগে গেল। কতো গাছ। কলকাতায় গাছপালা কম। তিতলি একবার পাপান আর রিয়াকে বলেওছিল সেটা। গড়ের মাঠে ঘোড়া দেখে খুব খুশি তিতলি। এখানে ধোঁয়াধুলো নেই। হাওয়া আর ঘাসের গন্ধ। কাকিমা বললেন, গাড়ির ধোঁয়াধুলো শহরের মানুষের জন্য খুব ক্ষতিকর। কাকু বললেন, তাই নিয়মিত গাড়ির

ইঞ্জিন পরিষ্কার করা দরকার। তাছাড়া চাকা, ব্রেক, আলো সব পরীক্ষা করে তবেই গাড়ি চালানো উচিত। খেতে খেতে ঠিক হলো, এবারে কাকিমা গাড়ি চালাবেন। রিয়া বলল, জানিস তিতলি, মায়েরও ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। কাকু বললেন, একটানা গাড়ি চালানো ঠিক নয়। তাতে ক্লান্তি আসে। ঘুম পায়। হাত-পা ঠিকমতো চলে না। তখন সিগন্যাল খেয়াল করা মুশকিল হয়। এতে দুর্ঘটনা ঘটে। শরীরে বা মনে উত্তেজনা বা অস্থিরতা নিয়ে গাড়ি চালানো ঠিক নয়।

খাওয়া শেষ করে আবার গাড়িতে উঠল সবাই। গড়ের মাঠ পার করেই বৃষ্টি শুরু হলো। সকাল থেকেই একটু মেঘলা ছিল। তখনই কাকু বলেছিলেন, মেঘলা দিনে বা আলো কম থাকলে গাড়ি আস্তে চালাতে হয়। শীতের দিনে কুয়াশা থাকলেও তাই।

বৃষ্টি বাড়তেই কাকিমা গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন। কাকু বললেন, ভিজে রাস্তায় চাকা পিছলে যায়। ঠিকমতো ব্রেক ধরে না। তাই ভিজে পথে সবসময় আস্তে গাড়ি চালাতে হয়। এটা বলতে বলতেই তিতলি দেখল সামনে একটা বিরাট গির্জা।

পাপান বলল, এটা সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল। তিতলি জানে, ছোটো গির্জাকে বলে চার্চ। আর বড়ো গির্জাকে বলে ক্যাথিড্রাল। রিয়া বলল, জানিস, এটা একবার ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে গেছিল। তিতলি মনে মনে বলল, এত সুন্দর গির্জাটা যেন আর না নষ্ট হয়। কাকিমা বললেন, একটু পেট্রোল ভরা দরকার। কাছেই একটা পেট্রোল পাম্প। সেখানে একজন মোটরবাইক চালকের সঙ্গে একজনের তর্ক হচ্ছে। বাইকচালকের মাথায় কেন হেলমেট নেই তা নিয়ে তর্ক। কাকু বললেন, বাইকচালক ঠিক বলছেন না। সবার উচিত হেলমেট পরে তবেই বাইক চালানো বা বসা। হেলমেট না পরার জন্য দুর্ঘটনায় বেশি জখম হয় মানুষ। বিশেষ করে ISI মার্কা হেলমেট পরা উচিত। পেট্রোল পাম্পের ভদ্রলোক বললেন নতুন আইন হয়েছে। এবার থেকে হেলমেট না থাকলে জ্বালানি পাওয়া যাবে না। পাপান বলল, নো হেলমেট নো ফুয়েল।

তিতলি দেখল একটা বাইকে চারজন বসে আসছে। রিয়া বলল, বাইক নয় যেন বাস। পেট্রোল দিতে দিতে হেসে উঠলেন

ভদ্রলোক। বললেন, এটা বিরাট সমস্যা। বাইক একজন বা দুজনের বসার জন্য। সেখানে এত লোক বসলে দুর্ঘটনা হতেই পারে। সেটা বললেন তিনি বাইকচালককে। ভদ্রলোক কথা দিলেন এমন আর করবেন না তিনি।

রাস্তায় বেরোলে তুমি কী কী করবে না —

- গাড়ি যাওয়ার সবুজ আলো জ্বলে উঠলে কখনই রাস্তা পারাপার করবে না।
- রাস্তার দৌড়াদৌড়ি করবে না।
- বড়ো গাড়ির দিক পরিবর্তনের সময় গাড়ির কাছাকাছি আসবে না।
- রাস্তার উপরে কখনই খেলবে না।
- বাস থেকে লাফ দিয়ে নামবে না। নামার আগে দেখে নাও কোনো চলন্ত গাড়ি বা মোটর সাইকেল আসছে কিনা।

তেল ভরে আবার গাড়ি ছাড়ল। এক জায়গায় রাস্তা একটু খারাপ। কাকু বললেন রাস্তার দেখভাল করা খুব জরুরি। খারাপ

রাস্তা তাড়াতাড়ি সারানো দরকার। হঠাৎ পাশ থেকে দুটো বাস ডানদিক বাঁদিক করতে করতে চলছে। কাকু বললেন, এই এক সমস্যা। এত দুর্ঘটনা হয়, তবু রেষারেষি করা চাই। কখনই বাঁদিক থেকে অন্য গাড়িকে ওভারটেক করা ঠিক নয়। আসলে যাত্রীরাও বাসে, ট্যাক্সিতে উঠেই তাড়া দেয়। বাসগুলোও অযথা আস্তে চলে। তারপরে একই রুটের অন্য বাস এসে গেলে রেষারেষি শুরু করে। তখন সিগন্যাল, ক্রসিং, বাঁক কিচ্ছু খেয়াল

থাকে না। যাত্রীরাও এই জন্য দায়ী। যেখানে সেখানে ওঠানামা করেন। অথচ নিয়ম হলো নির্দিষ্ট স্টপেজে ওঠা ও নামা। মাঝপথে বাস থেকে নামতে গিয়ে কত যে দুর্ঘটনা হয়। এক লেন থেকে অন্য লেনে ঢুকে পড়তে গিয়েও অনেকসময় দুর্ঘটনা ঘটে। রোজ হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে গাড়ি চালাতে হয় তাঁদের। তাই গাড়ি চালকের উপর মানসিক চাপ দিলে যাত্রীদের জীবনেরও ঝুঁকি বাড়ে। চালককে তাই কোনোভাবে চাপ দিয়ে জোরে চালাতে বলা ঠিক নয়। চালক ও তাঁর সহযোগীরাও তো আমাদেরই মতো মানুষ। তাঁদের সম্মান ও সহযোগিতা করা দরকার।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা অটো হুড়মুড় করে গাদা লোক নিয়ে চলে গেল। কাকু বললেন, এইভাবে বেশি লোক তুলে এরা মুনাফা করতে চায়। বোঝে না, জীবনের দাম বেশি। গাড়ি কালীঘাট ছাড়িয়ে গেল। রাস্তার ধারে একজায়গায় একটা প্রদর্শনী হচ্ছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা চালক ও পথচারীদের কাছে গিয়ে একটা কী যেন দিচ্ছে। তিতলিরাও নিল একটা চেয়ে।

তাতে গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও। পাশে SAFE DRIVE, SAVE LIFE বলে ইংরিজিতেও লেখা। তিতলি দেখল স্কুলের ছেলেমেয়েরা হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশরাও হাত মিলিয়েছে। অনেক পথচারী ও চালকরাও আছে। তিতলি, পাপান, রিয়াও গেল তাদের সঙ্গে। মাইকে ঘোষণা হলো, এবারে আমাদের শপথ নেওয়ার পালা। তখনই একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছিল। মাইকে ঘোষণা করা হল, আগে অ্যাম্বুলেন্সকে চলে যেতে দিন। সবাই পথ ছেড়ে দিল। তারপরেই সবাই গলা মিলিয়ে গাইল :

পথ সংস্কৃতি জানব
ট্রাফিক নিয়ম মানব
আমি সতর্ক হয়ে চলব
সুস্থভাবে এগিয়ে যাব

পথকে জয় করব
শান্ত জীবন গড়ব
পথ শুধু আমার নয়
এ পথ মোদের সবার
তা সর্বদা মনে রাখব

সবার সঙ্গে গলা মেলাতে দারুন মজা হলো তিতলির। ফেরার পথে বারবার মনে আওড়াল, সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ। রাত্রে নিজের খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখে নিল, সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও। মনে ভাবল, স্কুলে গিয়ে বন্ধুদেরও এটা বলতে হবে। শুধু কলকাতার গল্প নয়, এই পথের পাঁচালিও সবাইকে শোনাতে হবে।

রাস্তায় বেরোলে তুমি কী কী করবে —

- গাড়িতে বসার সময় সিট-বেল্ট ব্যবহার করো।
- বাবা-মা বা বড়ো কারোর সঙ্গে মোটর সাইকেলে

চাপলে নিজে হেলমেট পরো এবং অন্যকেও হেলমেট পরতে বলো। মোটর বাইকে কোনো শিশু বসলে বেল্ট দিয়ে চালকের সঙ্গে তাকে বেঁধে নিতে বলো।

- সিগন্যাল দেখে রাস্তা পার হও।
- জেব্রা ক্রসিং বরাবর রাস্তা পার হও।
- রেলওয়ে ক্রসিং পারাপারের সময় সিগন্যাল দেখে পার হও। সবুজ সিগন্যাল থাকলে, যাত্রীবাহী ট্রেন বা মালগাড়ি না চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

বলাবলি করে লেখো

তোমরা এবার পথ নিরাপত্তা বিষয়ে যা যা শিখলে তা নিয়ে ছবি আঁকো, ছড়া তৈরি করো। আর সবাইকে সচেতন করার জন্য পোস্টার তৈরি করো।

কু ঝিক ঝিক

পরের দিন। উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ আর ট্রেন নিয়ে কথা শুরু হলো। তিনটেই আশ্চর্য জিনিস।

উড়োজাহাজ আশ্চর্য জিনিস। কী করে ওড়ে?

ডুবোজাহাজ আশ্চর্য জিনিস। জলে ডুবে কী করে জোরে ছুটে যায়?

ট্রেন আশ্চর্য জিনিস। অত বড়ো গাড়ি দুটো সরু লাইনের উপর দিয়ে কী করে যায়? এক সঙ্গে এত লোক নিয়ে যায়!

স্যার ক্লাসে এলে রেলের কথাই আগে বলল সজল। স্যার প্রথমেই বললেন — একটা ট্রেন কত বড়ো বলো দেখি?

— নয়-দশটা বগি থাকে। এক একটা বগিতে তিন-চারটে বাসের লোক ধরে। একটা ট্রেনে ত্রিশ-চল্লিশটা বাসের লোক ধরে।

— এখন আবার সব বারো বগির ট্রেন হয়েছে। তাতে আরও বেশি লোক ধরবে।

আকাশ বলল — স্যার, মেল ট্রেনে আরো বেশি বগি থাকে। কুড়ি-বাইশ বগি। ভিতরে শোওয়ার জায়গা থাকে।

রুবি বলল — তুই তো রাত্রিতে গেছিস। তোর ভয় লাগেনি ?

— কীসের ভয় ?

— সরু লাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছে। যদি লাইন থেকে পড়ে যায়। এসব মনে হয়নি ?

স্যার বললেন — ট্রেনের দু-দিকের চাকার ভিতর দিকে খাঁজ থাকে। কোনোদিকেই লাইন থেকে সরতে পারে না। সুযোগ পেলে একটু ভালো করে দেখে নিও।

বিশু বলল — তাহলে ট্রেন নিজেই লাইনের উপর থাকে ? ড্রাইভারকে তার জন্য কিছু করতে হয় না ?

— ড্রাইভার সিগন্যাল দেখেন। ঠিক সময়ে স্টার্ট দেন। ব্রেক চাপেন।

একথা শুনে বিশুর খুব স্বস্তি হলো। রুবি বলল — স্যার।

ওর খুব ইচ্ছা ট্রেন চালাবে। শুধু ভাবে সরু লাইনের উপর চাকা রাখতে পারবে কিনা। আজ ওর ভয় কাটল।

নাসরিন বলল — আগে কয়লার ইঞ্জিনও ছিল। নানির কাছে শুনেছি।

— ঠিকই শুনেছ। স্টিম ইঞ্জিন। কয়লা পুড়িয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হতো। সেই বাষ্পের চাপে একটা মোটা পিস্টন বেরিয়ে আসত। তার ঠেলায় চাকা ঘুরত।

অরূপ বলল — স্যার, এসব কবেকার কথা? কত সাল থেকে এদেশে ট্রেন চলছে?

— ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল এদেশে যাত্রী নিয়ে প্রথম ট্রেন চলে। ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ট্রেন চালু হয়। এই রাজ্যে ট্রেন চলা সেই শুরু।

ইলিয়াস বলল - স্যার ট্রেন চলায় কী কী সুবিধা হয়েছিল?

— আগের থেকে যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে গেল। কম সময়ে বেশি রাস্তা যাওয়া সম্ভব হলো। মালপত্র নিয়ে যাওয়াও সহজ হয়ে গেল। তোমরা তো অনেকেই মালগাড়ি দেখেছ। কত কয়লা, লোহা, তেল নিয়ে যায়। অথচ কত সহজে চলে যায়।

অরূপ বলল — স্যার প্রথম থেকেই কী অনেক লোকে ট্রেনে চড়ত?

— না। প্রথমে সবাই ট্রেনে চড়ত না। অনেকেই ভয় পেত। যদি ধাক্কা লাগে। তাছাড়া সব জায়গায় রেললাইন ছিল না। আর একটা ব্যাপার ছিল জানো। ট্রেনে চড়ার সময় কোনো বাছ-বিচার করা যেত না। একটা বগিতে সবাই একসঙ্গে চড়ত। তাই সেখানে যেমন তোমরা সবাই

পাশাপাশি বসে পড়াশোনা করো। তেমনি ট্রেনেও সবাই সমান। আবার একটা ট্রেন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেত। এভাবে নানান অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মেলামেশা সহজ হয়ে এল ট্রেনে চড়ার মধ্যে দিয়ে।

পলাশ বলল --- স্যার আমি একটা সিনেমায় ট্রেন দেখেছি। দিদি ছোটো ভাইকে নিয়ে ট্রেন দেখতে দৌড়ে যাচ্ছে। কাশবন আর মাঠ পার করে।

— হ্যাঁ। ওটা খুব বিখ্যাত সিনেমা। পথের পাঁচালী। সত্যজিৎ রায় সিনেমাটা বানিয়ে ছিলেন। ওরা দুর্গা আর অপু। পথের পাঁচালী নামে একটা বইও আছে। খুব ভালো বই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। তোমরা একসময়ে পোড়ো। আর জানো, পৃথিবীতে প্রথম সিনেমাও ট্রেন নিয়ে হয়েছিল। একটা ট্রেন স্টেশনে এসে থামল। তার থেকে লোকে নামল। সেটাই পৃথিবীর প্রথম সিনেমা। লোকে সেটা দেখে চমকে গেছিল। ভেবেছিল পর্দা থেকে ট্রেনটা বুঝি বেরিয়ে আসবে।

বলাবলি করে লেখো

মানুষ ট্রেনে করে আর কী কী নিয়ে যায়? এসব নিয়ে বাড়িতে, পাড়ায়, নিজেরা আলোচনা করো। যারা ট্রেন দেখেনি তাদের অন্যরা বুঝিয়ে দাও। তারপর লেখো :

তোমার ঠিকানা	
বাড়ির সবচেয়ে কাছে রেল লাইন কোথা দিয়ে গেছে ও সেটা বাড়ি থেকে কত দূরে	
বাড়ির সবচেয়ে কাছের স্টেশনের নাম ও সেটা বাড়ি থেকে কত দূরে	
ট্রেনে করে মানুষ আর কী কী বয়ে নিয়ে যায়	

সামাজিক পরিবেশ

ফেরার পথে খুব ভিড় ছিল। বাস, লরি, মোটরগাড়ি, মোটরবাইক, রিকশার ভিড়। মানুষ তো আছেই। কষ্টেসৃষ্টে ভিড় পেরিয়ে নাসরিন বলল — দেশে এত লোক। তাই এত ভিড়। এত দূষণ। এত সমস্যা।

ইলিয়াস বলল --- সবাই যদি পরিবেশের কথাটা বুঝত! আর পরিবেশটার যত্ন করত! তাহলে এত সমস্যা থাকত না।

পরদিন ক্লাসে স্যারের সামনেই জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে কথা উঠল।

রুবি বলল — দাদু বলেন, আসল কথা শিক্ষা। সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ দেশের সম্পদ। সমস্যা নয়। তাঁরা অন্যের কথা ভাবেন, বোঝেন । তাঁরা পরিবেশেরও যত্ন করেন।

স্যার বললেন — ঠিক বলেছ। তাঁরা গাছ বাঁচান, গাছ বসান। গাছের যত্ন নেন। বিপন্ন পশুপাখি পতঙ্গদের কথা ভাবেন। চারপাশের জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করেন না। মানুষজনের পাশে থাকেন। এভাবেই সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অনেক মানুষকে নিয়ে সমাজ। সবাই সমান সুযোগ নিয়ে জন্মান না। একই রকম সুযোগ পেয়েও কেউ এগিয়ে যান, কেউ পারেন না। এঁরা সবাই পাশাপাশি থাকবেন। প্রত্যেকে নিজের মতো করে বাঁচবেন। কিন্তু কেউ কাউকে ছোটো

ভাববেন না। অন্য কাউকে ঘৃণা করবেন না। তবেই সামাজিক পরিবেশ সুস্থ হবে।

বিশু বলল — একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

স্যার হেসে বললেন — রুবি, তোমার দাদু তো এমন মানুষের উদাহরণ। তাঁর কথা বলবে নাকি সবাইকে?

রুবি বলল — দাদু ছোটোবেলায় খুব গরিব ছিলেন। সংসারের অনেক কাজ করতেন। নিজেই পড়তেন। বুঝে বুঝে পড়তেন। বন্ধুদেরও পড়া বোঝাতেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই নানা কারণে স্কুলে পড়তে পড়তেই লেখাপড়া ছেড়ে দেন। কেউ মাঠে মুনিষ খাটেন। কেউ বাজারে আলু বেচেন। পরে দাদু হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিলেন। কিন্তু দাদু স্কুলের বন্ধুদের কাজকে সম্মান করেন। চাষ, বাজার-দোকান এসব ব্যাপারে তাদের মত নেন।

বলাবলি করে লেখো

অনেকেই সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গঠনের চেষ্টা করেন। তোমার দেখা তেমন একজন মানুষের কথা লেখো :

তাঁর নাম ও ঠিকানা	
তিনি কী করেন বা করতেন	
তোমার সঙ্গে তাঁর কী ধরনের পরিচয়	
জীবিকার জন্য নয়, এমন কী কী কাজ তিনি করেন	
তিনি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ার চেষ্টা করেন ভাবছ কেন	

স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে

রুবির দাদুর কথা সবাই জানত। আয়ুব ভাবত, তিনি মাছের চাষ করেন। স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন শুনে অবাক হয়ে গেল। ফেরার পথে রুবিকে বলল — তুই যে বলেছিলি দাদু মাছেদের কথা অনেক জানেন!

রুবি বলল — জানেন তো। পুকুর আছে না! ছোটোবেলায় ওই পুকুরের আয়েই তো সারা বছরের অর্ধেক খরচ চলত।

এবার আয়ুব বুঝল ব্যাপারটা।

সুনীল বলল — তোর দাদুর কী এখন অনেক বয়স?

— আমি যেবার ওয়ানে ভরতি হলাম, সেবার অবসর নিলেন। এখন চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি হবে। কিন্তু দেখলে মনে হবে পঞ্চাশ।

এখনও সাঁতার কাটেন। রোজ আধ ঘণ্টা। আমাকে সাঁতার শিখিয়েছেন। ছুটিতে যাই। সাঁতার কাটি। এখানে পুকুর নেই। তাই এখানে সাঁতার কাটা হয় না।

— পুকুর তো আছে। তোদের বাড়ির কাছেই তো!

— ওই জল তো নোংরা। ওখানে সাঁতার কাটলে ত্বকের সমস্যা হবে! দাদুর পুকুরের জল ঝকঝকে। অথচ মাছ বোঝাই। এই খাবার দিচ্ছেন। আবার মেশিন দিয়ে জলে বাতাস গুলে দিচ্ছেন। কিছুদিন পরপর পটাশিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট দিচ্ছেন।

নাসরিন বলল — দাদু কি শুধুই সাঁতার কাটেন? হাঁটেন না? অন্য ব্যায়াম করেন না?

— কাজের দরকারে অনেক হাঁটেন। যাঁরা হাঁটাহাঁটি করেন না, দাদু তাঁদের বলেন ব্যায়াম করতে।

বলাবলি করে লেখো

স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য বিভিন্ন বয়সে কী কী করা ভালো? বাড়িতে, পাড়ায়, নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

বয়স	সাঁতার কাটা	নির্দিষ্ট সময় টি ভি দেখা	ব্যায়াম	অনেকক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করা	হাঁটা	সাইকেল চালানো	পরিমিত ঘুমানো	অতিরিক্ত প্যাকেটজাত খাদ্য না খাওয়া
৫-১০ বছর								
১০-১৫ বছর								
১৫-৩০ বছর								
৩০-৪৫ বছর								
৪৫-৬০ বছর								
৬০ বছরের বেশি								